উৎপাদন, পুনরুৎপাদন এবং ভোগঃ ত্রিদর্শনের আলোকসজ্জা

ড. আবীর চট্টোপাধ্যায়

প্রাককথন

কেন এমন প্রসঙ্গের কথা তুলছি? কী প্রয়োজন আর এসবের? জনজীবনে চলতে, ফিরতে, খেতে, বসতে আজকাল এত ধরণের সমাধান রয়েছে তারপরেও এ কী ধরণের গল্প, কীসের গল্প, অথবা কোন গল্পকথা যা এমন অসময়ে basic কথাবার্তা বলে বিব্রত করতে হয়? এমন অনেক প্রশ্নই পাঠকের ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে পারে এবং এই অর্বাচীন সম্পর্কে অচিরেই বিশেষ ধারণা জন্মে যেতে পারে। তবু বলার প্রয়োজন অনুভব করার বিশেষ কারণ হিসেবে বলতে পারি, আজ যে কোনো সৃষ্টির নেপথ্যে যেভাবে অতি-বাণিজ্যিকতার এক নয়া-সামাজিক প্রবল বিজ্ঞাপনী (advertorial) প্রভাব সৃষ্টির নেপথ্য স্বাধীনতাকে হরণ করে চলেছে প্রতিমুহূর্তে – তাতে সৃষ্টির গল্পকথা আর গল্পের সৃষ্টিকথা সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। তবে সবাই যে সৃষ্টির স্বাধীনতা প্রসঙ্গটিকে একই দৃষ্টিতে দেখবেন তা নয়, অতি-বাণিজ্যিক প্রভাব সম্পর্কে অনেকেরই একটা সভ্যতার অগ্রগতিসূলভ মত আছে, আর এটা খুব অস্বাভাবিক ভুলও নয়। যাইহোক, এই গল্পকথা আর সৃষ্টিকথা-কেই এখানে দর্শন বলে প্রকাশ করছি। আর গোটা সন্দর্ভকে 'উৎপাদন' বলে চিহ্নিত করছি। সামগ্রিকভাবে উৎপাদন সন্দর্ভকে এখানে দুভাগে বিচার করা হয়েছে। এক, 'বস্তু' উৎপাদন; দুই, তারই 'বিষয়' উৎপাদন এবং সর্বোপরি সংস্কৃতির উৎপাদন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয় বস্তু তার আপন বিষয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য থাকে, কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রশ্ন থেকেই যায়, বস্তু আর বিষয়ের উৎপাদন কি পৃথক? তারা কি পৃথকই থাকে সর্বসময়? যদি তারা পৃথক থাকে তাহলে আমরা নয়া-আধিপত্যের দ্বিমুখী প্রভাব সম্পর্কে কতটা সচেতন? সমকালে শোষণ তথা আধিপত্যের চেহারাটি কি একইরকম যা দু-দশক, তিনদশক আগেও যেমনটি ছিল? এটাই এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। প্রবন্ধটি খুব সহজ করে লেখা বা একে সুপাঠ্য করে তোলার কোনো চেষ্টা করা হয়নি। এর মূল কারণ, পরিস্থিতি তেমন ভালো নয়, বরং বলা যায় বেশ জটিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "নিকটকালকে খুশি করতে গেলে চিরকালকে হারাতে হয়"। কাজেই সে চেষ্টা করা হয়নি।

Society Language and Culture

ভূমিকা

দর্শন কি সৃষ্টি হয়? যে কোনো ism-ই কি দর্শন, না কি দর্শনের একটা প্রকাশ বা প্রচলিত ধারণা (যা সিগনিফায়েড হয়েছে) যাকে সৃষ্টি বা নির্মাণ করা হয়েছে? দর্শনের ইংরেজী প্রতিশব্দ ফিলোসফি'র আকর বিশ্লেষণ 'জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা' (Philo and Sophia) দিয়ে আজকের অতিজটিল পরিস্থিতিতে আর তেমন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। সমাজদর্শন, ধর্মদর্শন, মানবদর্শন, প্রকৃতিদর্শন, মনোদর্শন, জীবনদর্শন, জীবনাদর্শ, শ্রেণিদর্শন, বিভিন্নরকমের পেশাদর্শন, সংস্থার এথিক্স, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি এই সমস্ত জ্ঞানপ্রণালীর যে 'অবয়ব' আমরা সচেতনে বা অচেতনে গড়ে তুলি তাইই দর্শন বা তাকেই দর্শন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আসলে এসবই কি এক একটা গল্প, বা পরিস্কার করে বললে গল্প-কথা, যা উৎপাদিত হবার পর আমাদের নানারকমের জীবনশৈলী গড়ে তুলতে সহায়ক হয়, আবার কোনো গল্প নিজেই বিশেষ জীবনধারার উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে? আবার সাধারণ জীবনে প্রতিপদে জ্ঞাপন করতে করতে আমাদের সক্রিয়তার যত ধারা সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল নির্মিত হয়েছে তারা অধিকাংশই নিজেদের স্বাধীন দর্শন বলে দাবিও করে। তবে যে ধরণেরই দর্শনই হোক না কেন, তার নির্মাণ হয়েছে অর্থাৎ উৎপাদন'এর নিয়মতান্ত্রিকতা (কোড) থেকে, বা আরও খুলে বললে নির্দিষ্ট উৎপাদন কোড ব্যবহার করে। এখন প্রশ্ন হলো কী উৎপাদন করে অথবা উৎপাদন'এর 'কী' ব্যবহার করে? এর উত্তর হতে পারে – একটা মনোগত অবয়ব (কন্টেন্ট) উৎপাদন ক'রে অথবা উৎপাদনের এক অবয়ব সচেতন মননে নিশ্চিত ক'রে বা পরিমাপযোগ্য করে। রবীন্দ্রনাথে এর সত্যতা অনেকটাই প্রকাশিত। তিনি বলছেন,

"সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইঁটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী; দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী..."(ভারতী)।

পাশাপাশি একথাও ঠিক, ১৮৮৭ সালের রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে সৃষ্টিসম্পর্কে ন্যাচারাল বললেও পরে ১৯২২-এর রবীন্দ্রনাথ একে আবার গল্প নির্মাণের কথা বলছেন অর্থাৎ নির্মাণ দশা'কে স্বীকার করছেন। তাই সাহিত্যসৃষ্টি থেকে দর্শনসৃষ্টি পর্যন্ত আমরা নেপথ্য 'কোড' বা সত্ত্বা তাকে ধরা যায় কি যায় যায় না এই নিয়ে তর্কের অবকাশ রাখব। প্রকৃতিগত সৃষ্টির নেপথ্য নিয়ে বুদ্ধিজীবীমহলে তেমন কোনো প্রশ্ন না থাকলেও সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্য নিয়ে 'চর্চামহলে' এবং

Society Language and Culture

'শিক্ষামহলে' রহস্যভেদ করা গেছে, অর্থাৎ 'কেন' উনি এরকম বললেন বা এরকম লিখলেন, এমন ভাবনা রীতিমতো সক্রিয় এবং বরাবর রহস্যভেদের কৃতিত্ব দাবি করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রমথ বিশী'কে বলতেন, "তোরা আমাকে নিয়ে পড়েছিস। সাবজেক্ট হিসেবে আমি কি নিতান্তই সহজ?" অর্থাৎ এর বিকল্প পঠন এবং তৎসহ সামাজিক সম্পর্কের কথাপ্রসঙ্গই এই প্রবন্ধের মূল উৎসাহ।

ভগবানের ভাবনা থেকে স্বরূপ পর্যন্ত উৎপাদন বা নির্মাণের নেপথ্যে জীবনদর্শন এবং সমাজদর্শন যেমন সক্রিয় রয়েছে এতকাল, তেমনি বস্তুদর্শন উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নেপথ্যের জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন ভিন্নরূপে ভিন্নমাত্রায় সক্রিয় রয়েছে। দুই ভাবনার নেপথ্যেই রয়েছে উৎপাদন কোড'এর উদ্ভাবনী ক্ষমতা, যে উৎপাদন কোড দিয়ে আসলে ভাবনা উৎপাদন করা যায়। এই হলো গল্পের বা ভাবনার সাংস্কৃতিক অবয়ব। প্রশ্ন হলো এই উদ্ভাবনী কোড সম্পর্কে আমাদের কী ধারণা। এর প্রকাশ যেমন বৈচিত্র্যময় হতেই পারে আবার সাংগঠনিকভাবে কিছু পরিমাণ নির্দিষ্টও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একেই গল্পের উৎপাদন বলতে চেয়েছেন যার মাধ্যমে একটা গোটা এপিক উৎপাদিত হতে পারে আর যার ভিত্তি হলো আমাদের চিরকালীন জ্ঞাপনসক্রিয়তা।

"নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হতেই প্রশ্ন এই – কী হল হে, কী খবর, তার পরে। এই 'তার পরে'র সঙ্গে 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস" (লিপিকা- গল্প)।

এই 'তার পরে' তৈরি হয় সেই কন্টেন্ট অথবা সেই অবয়ব যা 'সৃষ্টি' করি এবং 'তার পরে' জ্ঞাপন করি,। আবার ওই একই গল্পে তিনি বলছেন,

"বিধাতার-রচা ইতিহাস আর মানুষের-রচা কাহিনী এই দুইয়ে মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল যে অশোকের গল্প আকবরের গল্পই সত্য তা নয়; যে রাজপুত্র সাত-সমুদ্র পারে সাত রাজার ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য। আর সেই ভক্তিবিমুগ্ধ হনুমানের সরল বীরত্বের কথাও সত্য যে হনুমান গন্ধমাদনকে উৎপাটিত করে আনতে সংশয় বোধ করে না। এই মানুষের পক্ষে আরঙ্গেব যেমন সত্য দুর্যোধনও তেমনি সত্য। কোনটার প্রমাণ বেশি

Society Language and Culture

কোনটার প্রমাণ কম, সে হিসেবে নয়। কেবল গল্প হিসেবে কোনটা খাঁটি, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে সত্য"।

অর্থাৎ ক্রমাগত জ্ঞাপন করে করে যত গল্প নির্মাণ হয় তাকে আবার জুড়ে জুড়ে মালা গেঁথে হয়ত কোনো দর্শন তার পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় এবং যেমনটি জার্মান তাত্ত্বিক ইউরগেন হেবারমাস বলছেন, 'আসলে একটি বইয়ে পরিণত হয়'। ফলে দর্শনের অন্দরে আদ্যন্ত গল্পমালার ধারাবাহিক জ্ঞাপনই একে অপরকে জড়িয়ে রয়েছে। হয়ত এ লেখা পড়তে পড়তে ভাবছেন গল্প কেমন করে প্রামাণ্যের নিরিখে বিচার্য হয়? এখানে আবার রবীন্দ্রনাথের কথাটি পুনঃপঠনযোগ্য..."অর্থাৎ কোনটার প্রমাণ বেশি আর কোনটার প্রমাণ কম সে হিসেবে নয়। কেবল গল্প হিসেবে কোনটা খাঁটি, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে সত্য"। যদিও এর পরেও উত্তরের অপেক্ষায় একটি প্রশ্ন থেকেই যায় আর তা হলো গল্প জ্ঞাপনের অভিপ্রায় (বা ইচ্ছে) বা কারণ বা অর্থক ইংরেজিতে যাকে বলে সিগনিফায়ার – যেখানে একটি প্রশ্ন সাধারণভাবে চলেই আসে – কেন গল্পটি উৎপাদিত হলো বা জ্ঞাপিত হলো? প্রশ্নটি খুব সহজ হলেও এর উত্তর পাওয়া ততটাই কঠিন। তাই সাধারণভাবে আমরা "গল্পটা আসলে কী বলতে চাইল?" – নীতিমালার মতো এর উত্তর দিয়ে চালিয়ে নিই। তবে এই প্রবন্ধে তেমন ভিক্টোরীয় বা অধুনা ভারতীয় কোনো নীতিমালার খোঁজ করা হবে না বলাই বাহুল্য।

উৎপাদনের নেপথ্যে

তাহলে উৎপাদনের অভিপ্রায় বা ইচ্ছে'টা ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে ভাবনা উৎপাদন করা এবং তাকে আবার বার্তা বলে পরবর্তী সময়-পরিসরে সক্রিয়তা ও ভাষাপ্রয়োগের নতুন কোড'এ প্রতিস্থাপন করা এবং পরবর্তীকালে নতুনতর প্রয়োজনে তাকে পুনর্বার বলা, এই হলো সামগ্রিক পথ। যেমন ধরুন বামপন্থা, দক্ষিণপন্থা – সামাজিক প্রশ্নে এদের নেপথ্যের দর্শনের অস্তিত্ব যেমন আছে, তেমনি সেই অস্তিত্ব অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতির অবয়বের উৎপাদনও যথেচ্ছ হয়েছে। যেমন দর্শনগত প্রশ্নে শ্রম, ত্যাগের রক্ত থেকে রক্তপতাকা হয়ে রক্তঋণের শপথ এবং সবশেষে লাল আবির ও লাল টুনি বাল্ব পর্যন্ত সবই সামাজিক ক্ষেত্রে আঙ্গিক বা অবয়ব হিসেবে নির্দিষ্ট পরিসর নিয়ে আছে। একই কথা প্রযোজ্য ইসলাম থেকে ভারতে দক্ষিণপন্থার সবুজ নির্ভরতা, আর নিজেদের আপন হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের পক্ষে রাজনৈতিক দল থেকে অন্যান্য সংঘ, সংগঠনগুলিও সামগ্রিকভাবে গেরুয়া রঙ প্রস্তুত করে

Society Language and Culture

ফেলেছে ইতিমধ্যেই, আবির থেকে কার্পেট হয়ে মায় খাবার দাবার পর্যন্ত। আমরা কথায় কথায় বলি আমার সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কৃতি, ওদের সংস্কৃতি, জাতীয় সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতি ইত্যাদি নানাবিধ কোড, আর তাই দিয়ে আমরা অনেক কিছুই বলে দিতে বা বোঝাতে চাই। তবে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন কোড'কে এখানে দুটি অর্থক বা সক্রিয়তার পংক্তিতে বিচার করা হবে, এক, ব্যক্তি উৎপাদন সিগনিফায়ার আর দুই, গণউৎপাদন সিগনিফায়ার। অর্থাৎ যে কারণে ব্যক্তিগত পরিসরে উৎপাদন করতে চাই আর যে যে কারণে গণপরিসরে উৎপাদন করতে চাওয়া হয়।

এখন যা উৎপাদন করতে চাওয়া হয় তার বার্তা নেপথ্য দর্শনকে জড়িয়ে ধরে থাকে। কেউ যদি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনে থাকেন তবে দেখবেন এক প্রাচীন 'মিথ' কে কীভাবে সমসাময়িক 'মিথ'এ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই গল্প) রূপান্তরের এক প্রবল প্রচেষ্টা চলছে। এই রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে অযোধ্যায় মন্দির স্থাপনের যাবতীয় সাম্প্রদায়গত উদ্যোগ তাকে বৈধতা দেওয়ার পর্ব চলেছে। স্বভাবতই এর জন্য প্রয়োজন এক প্রবল প্রাতিষ্ঠানিক এবং দর্শনগত উদ্যোগ যা দিয়ে এক সামগ্রিক উৎপাদন হয়ে চলেছে। এই উদ্যোগ হলো আদর্শ আর তার নেপথ্যে থাকে 'কেন' বলতে চায় সেই দর্শন। আবার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কোড বা বক্তব্য আমরা দেখতে পাই; সেও আরেক গল্প। এর কোনোটা মানুষঘাতী, প্রকৃতিঘাতী, পরিবেশঘাতী আবার মানুষের মুক্তিবাসনার গণ-উৎপাদনও আমরা ইতিহাসে দেখেছি। বিশ্ব সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি দর্শনে এই দুই কোড ইতিহাসের সামগ্রিক মূল্যায়নে প্রধানতম উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাই 'উৎপাদন' বা সৃষ্টি কোড'এর যতরকমের বৈচিত্র্য মানবমনে ধরা পড়েছে তাকে সম্বল করে সমস্ত ভাবনার বিচার করা হয়। আর যা ধরা পড়েনি তাকে কখনো আবিষ্কার করা হয় আবার কখনো অবাঞ্ছিত বা অপাংক্তেয় বলে ছুঁড়ে ফেলা হয় বা এতকাল এটাই হয়েছে। কিন্তু এই পর্বে গল্পদর্শন আর তার মূল্যায়ন একই মূলগত দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থাৎ সমাজপটে দুটি পরস্পরবিরোধী 'বেশি প্রামাণ্য' বা 'কম প্রামাণ্য' বলে বিচার করার ফলে হয় আসলে তার বাস্তব অবস্থানের মূল্যায়নই হয় না, অথবা মূল্যায়নের নামে ভালো-মন্দ, দরকারী-অদরকারী, এমন সব নেতিবাচক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, যার কোনো অন্ত পাওয়া যায় না। এর ফলে কখনো চির-ভয়ংকর কোনো সংস্কৃতি মরে গিয়েও তার শিকড় থেকে যায়; আবার অন্যদিকে মুক্তির খোঁজে বেড়ে ওঠা কোনো অসহায় সংস্কৃতিভাবনা উৎপাদিত হয়েই অবভাষ (subversion) বা ভুলপথ

Society Language and Culture

বলে বিবেচিত হয় এবং সমকালীন বুদ্ধিজীবী মহলের কদর পায় না। যেমন সতীদাহ প্রথা মরেও মরে না, এবং সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রীর কলামে আজও তার কারণ বা উপাদানগুলিগুলি ছেড়ে যায়, আবার বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের সঙ্গে বলপূর্বক বিবাহের গহ্বর থেকে নিজেদের বাঁচাতে উনিশশতক থেকে আজ পর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে কোনোক্রমে বেঁচে থাকা বা বিক্রী হয়ে যাওয়া নারীদের আত্মকাহিনী সিনেমায় জনপ্রিয় হলেও বুদ্ধিজীবী বা বাক-জীবী মহলের স্বীকৃতি পায় না।

ফলে মানুষ নানারকম সমান্তরাল সংস্কৃতির কোড উৎপাদন করে পড়তে মরতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। মানবমুক্তির প্রশ্নে আসল দ্বন্দ্ব তো এখানে অর্থাৎ সমাজে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে গণমানুষের হয় (১) প্রথমে বিরোধ পরে সাযুজ্য বা আপোষ; নাহয় (২) চিরদ্বন্দ্ব এবং পরিসরের স্বাতন্ত্র্য। এই দুইভাবেই বেঁচে থাকা যায়। প্রশ্ন হলো কীভাবে বাঁচাটা শ্রেয়? দুই, একটি শর্তের মধ্যে বাইনারি সম্ভাবনা খুঁজে লাভ নেই। বিপ্লব বা পরিবর্তনের আগেও নেই, পরেও নেই। সমাজে দুই শর্তই সমানভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সৃষ্টির নেপথ্যদর্শন

আবার জ্ঞান ও সাহিত্যকৃত্যের নেপথ্যের দর্শন খুঁজতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই হয় সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করে সিলেবাস পড়ানোর মতো নিশ্চিত সমাধান করে দেওয়া হয়, নাহয় কবি বা স্রষ্টার জীবন তথা অতীত ঘটনাবলীর সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজতে হয়। যেমন 'সোনার তরী' কবিতায় 'রবীন্দ্রনাথ কেন এমন লিখলেন' এই দর্শন খুঁজতে গিয়ে হয় রবীন্দ্রমনের সেই অজানা অতলে যাবার চেষ্টা করতে হয়, নাহয় পাশাপাশি কয়েকটি সময়-পরিসরে রবীন্দ্রদর্শন যা যা সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে সাযুজ্য প্রমাণের চেষ্টা করতে হয়। এই দুটিই গোয়েন্দাসূলভ ভাবনা একই উৎপাদনপটে হবার ফলে সেই 'উৎপাদন' বা সৃষ্টি কোড'এর রহস্য থেকেই যায়। অথচ আমি কেন পড়লাম, পড়ে আমার কী মনে হলো, কী প্রয়োজনে আমি পড়লাম, রবীন্দ্রনাথ নিজেই যখন 'সোনার তরী'র পাঠক তখন তিনি নিজেই কি তার উৎপাদন রহস্যের সমাধান করতে পারেন, আমি সহ আরও যাঁরা পড়ছেন তাঁদের ভাবনার সূত্র ধরে আমি কি এগোতে পারি, এই যাবতীয় প্রশ্ন উপরের উৎপাদন রহস্যভেদ'এর দাবির থেকে অনেক স্বতন্ত্র। কবি সমালোচক শঙ্খ ঘোষ বলছেন,

Society Language and Culture

'...ওই গান, ওই কবিতা, ঐ নাটকের বিচারে সত্যিই কি জানবার দরকার আছে সাধারণ্যে অগোচর এইসব তথ্য?...রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা নাটক নিয়ে যে কথাবার্তা, তা একেবারে গড়িয়ে গেছে শুধু রবীন্দ্রনাথের দিকে? তাই তো হবার কথা, কেউ কেউ বলবেন। কিন্তু তা-ই কি হবার কথা? রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে, রবীন্দ্রনাথের গান শুনে, রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখে আমরা কি রবীন্দ্রনাথকেই চাই, তাঁকেই জানতে চাই আরো বেশি বেশি করে? না কি জানতে চাই সেই কথাটুকু, সেই বেদনাগুলি, যা তিনি বলতে চেয়েছিলেন'।[১]

আবার ঐ প্রবন্ধেরই পরিণতিপর্বে তিনি বলছেন,

"রক্তকরবী লিখবার মুহূর্তে সদ্যযুবতী রাণু অধিকারীর ক্ষিপ্র চলাচল, তাঁর সরল এবং অদম্য দিনযাপন, সুসামাজিকতার সমস্ত জাল, তার বাধা আর নিয়মতন্ত্র ভেঙে দিয়ে কবির একলাজীবনের উষরতার মধ্যে তাঁর নবীন এক সঞ্চার নিয়ে আসাঃ নিছক তথ্য হিসেবে এর দাম নেই তা নয়। কিন্তু সে তথ্যকে প্রধান করে তুললে তাকে কি বলা যাবে সেই মহান্টকের অভিপ্রায় যা আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের বহু বিচিত্র কটিল অভিজ্ঞতাকে একইসঙ্গে ধরে রেখেছে বলে দেখতে পাই?"[২]

ফলে আসলে কী ঘটনা উৎপাদনের নেপথ্যে ছিল বলে দাবি করা হয়, তার কোনোকিছুই লেখকের অভিপ্রায় বা উৎপাদনের অভিপ্রায় বলে ধরে নেওয়া সঠিক কাজ হতে পারে না। এই পর্বে শঙ্খ ঘোষ বলছেন,

"...আর যখনই এটা ভুলে যাই তখন লেখা আর পাঠকের মাঝে লেখকের শুকনো উপাদানটাকেই লেখকের অভিপ্রায় বলে ভুল করতে থাকি। লেখাকেই আমরা চাই, লেখককে নয়। নিষ্ঠুর শোনালেও কথাটা সত্য যে সোনার ধানটুকুকেই চাই আমরাঃ নৌকোয় যিনি তুলে দিয়েছিলেন, তাঁকে নয়"।[৩]

আবার বিংশশতাব্দীর মধ্যসময় থেকে একেবারে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক ভাবনাক্ষেত্রে দর্শননির্ভর আলোচনার একটা অদ্ভুত প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দর্শনগত কোনো আলোচনা বা কোনো বিরূপ সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে দর্শনগত বিশ্লেষণের অনেক আগেই সেই ঘটনা বা বিরূপ সমালোচনার প্রবল এবং কিছুক্ষেত্রে কদর্যভাষায় পালটা সমালোচনা শুরু হয়। এতে কী হতে পারে? আলোচনার চেয়ে লেখকের জীবন বা অন্দরের আদ্যোপান্ত নিয়ে গালিগালাজ এবং আপন দর্শনরক্ষার নামে সেটা যে কত

Society Language and Culture

ভালো তার একটা গোদা বর্ণনা হতে থাকে (একথার মানে এই নয়, যে, কখনো কোনোভাবেই লেখকের জীবন প্রাসঙ্গিক হবে না; কিন্তু তার বিচার করতে হবে মূল্যায়নকারীকে)। এই ধরণের লেখাগুলির ভাষাও খুব চোখে পড়ার মতো – যেমন জবাব দেওয়ার শুরুতেই যদি এমন মন্তব্য করা হয় – ইদানিং কিছু কিছু বালখিল্যের মতো শিশুসুলভ আলোচনা চলছে/শুনছি – কোনো জবাব যদি শুরুতেই এমন গোয়েন্দাসূলভ চেহারা গ্রহণ করে তাহলে পক্ষপাতিত্বের পক্ষে সহজ হতে পারে কিন্তু বৃহত্তর জনমানসে তার কোনোই প্রভাব পড়বে না, কারণ কেন যে সেই সমালোচনা করা হয়েছে তাকে না বুঝেই গাল পেড়ে দেওয়া হয়েছে। হয়ত আর একটু স্থৈর্যের প্রয়োজন ছিল, সেই সমালোচনা ঠিক বলে নয়, হয়ত ভুল বলেই।

এর ফল যেটা দাঁড়াল, কতগুলি শব্দবন্ধ বা শব্দগুচ্ছ একরকমের প্রতীকী চেহারা পেয়ে গেল এবং সেটা কথায় কথায় বিভিন্ন লেখায় যত্রতত্র ব্যবহার হতে লাগল। অচিরেই সেটা বুদ্ধিজীবীর হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে চরম দক্ষিণপন্থারও হাতের অস্ত্র হয়ে যেতে লাগল। এইভাবে প্রাতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে মিশে একধরণের ক্ষমতার ভাষা সৃষ্টি হয়ে গেল, যা সমাজের যে কোনো প্রকোষ্ঠ থেকে গণমাধ্যমে সমানে কামান দাগার মতো বর্ষিত হতে লাগল।

'রবীন্দ্রনাথ কেন লিখলেন', 'উনি কেন শিশুসুলভ কথা বলছেন', 'এটা নিতান্তই বালখিল্যপনা', 'উনি দেশের কী বোঝেন', 'ইনি জনগণের কী বোঝেন' – এই জাতীয় উৎপাদন সামগ্রিকভাবে দর্শনভাবনাকেই একেবারে এতটাই জলবৎ করে তুলেছে যে হাতে তোলার প্রবৃত্তিটুকু নষ্ট হয়, অথচ স্বজনমহলে এর কদর বেড়েই চলেছে। এর ফলে সমালোচনার পালটা/বিকল্প তাত্ত্বিক সম্ভাবনা দূরে থাক, গালি'র পালটা গালি চলতে থাকে এবং দেশের প্রভাবশালী প্রাতিষ্ঠানিকতা' এবং তার পারিষদগণ বসে বসে বধ্যভূমিতে কামড়াকামড়ির মজা দেখে এবং জনমানসে এর কোনো প্রভাবই পড়ে না। এখানে আমি মধ্যবিত্তের পোশাকি ভদ্রতার বিকল্প বলব না। অথচ একটা গভীর সমালোচনা যোগ্য জবাব হতেই পারে এবং প্রাতিষ্ঠানিকতাও প্রমাদ গুণতে পারে আবার সামাজিক বিকল্পও সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অবশ্য তখনই এতে বুদ্ধিজীবীর গায়েও আঁচ আসতে পারে, যেমনটি এসেছে গৌরী লঙ্কেশ, কালবুর্গী, ভারভারা রাওয়ের উপর। কিন্তু একবার গাল পাড়ার মতো কিছু করে ফেললে পরবর্তী সময়ে সর্বত্র সেটা 'বাইনারি'তে উত্থাপিত হয়, গণমাধ্যমে সেই তর্কের খুব প্রচার হয়, সবাই নানারকমের মজা দেখে এবং পরিশেষে তা পরিত্যক্ত হয়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সামাজিক সুরক্ষাও প্রকারান্তরে বজায় থাকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় চুটকুলে মার্কা বক্তব্যেই কাজ সারা হয়।

Society Language and Culture

স্বভাবতই সমাজক্ষেত্রে যাবতীয় পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের নেপথ্যের দর্শনের অবয়বটিকে ধরা যতটা কঠিন, সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণাতত্ত্ব বা কোড উৎপাদন করা তত কঠিন নয়। গণমাধ্যমে বসে এবং সংবাদের ভাষা সৃজনে বা উৎপাদনে এ ঘটনা রোজ ভুরি ভুরি ঘটে চলেছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদী সময় থেকে আজকের বিশ্বায়িত পুঁজিবাদের সময় পর্যন্ত গণউৎপাদন বা সামাজিক প্রশ্নে উৎপাদনের মাহাত্ম প্রসঙ্গে সদাবিরোধী, মুখোমুখি বিবদমান সামাজিক কোড'গুলি কালে কালে বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত এই কোড'এর সম্প্রচার প্রবলতর হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাই একদিকে অ্যাডাম স্মিথ'এর রচনায় প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্থাৎ প্রশাসনিক নানা অত্যাচারী প্রক্রিয়া এবং জনগণের মধ্যে তার 'বৈচিত্রপূর্ণ' প্রভাব প্রকাশিত হলো। আবার মার্কস তাঁর রচনায় সেই বৈচিত্র্যকেই শোষণের নিরিখে 'একীভূত' করে প্রথমে 'দ্বন্দ্ব' নামক প্রাথমিক ধারণা এবং পরবর্তী সময়-পরিসরে তাকেই সিগনিফায়ার হিসেবে বিপ্লব পর্যন্ত ব্যবহারের 'পথ' রচনা করলেন। কেন করলেন? এই প্রশ্নের অন্দরে এমন এক সত্য লুকিয়ে আছে যা দুজনকেই ইতিহাসে অমর করেছে এবং কোনোটিকেই অগ্রাহ্য করা যায় নি। তাই দ্বন্দ্ব'কেই সিগনিফায়ার হিসেবে ধরে নিয়ে দুজনেই একই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে দুটি ভিন্ন 'অন্তিম' বা উপসংহার রচনা করলেন। ফলে শেষে যেটা দাঁড়াল সেটাই আসলে প্রথম – অর্থাৎ ভিন্ন বক্তব্যের নেপথ্যে একই দর্শনগত সিগনিফায়ার। সময়ের এই গোটা পথ পরিক্রমা করলে দেখা যাবে দুই পথেই যত দিন গেছে সমাজ-কোড'এর সৃজন ও উৎপাদন প্রবলভাবে বেড়ে চলেছে। যে পথে গণউৎপাদন'এর ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট শ্রমধারণা বা ইউনিক শ্রম কোড দিয়ে 'উদ্বৃত্ত শ্রম' পরিমাপ করে মার্কস এক সুনিশ্চিত ভবিষ্যত রচনা করলেন, আজ তাকে 'কেন' এবং 'কীভাবে' খোঁজা চলছে তার নতুন কারণ (সিগনিফায়ার) তো নতুন করে জেগে উঠবেই। কিন্তু সে যাত্রা কঠিন বলে সহজপথের জোটবদ্ধতা অর্থাৎ যেমনটি সবাই করছে বলে নেমে পড়লে, যা ঘটার তাই ঘটবে।

সমাজক্ষেত্রে যে উৎপাদন কোড সম্পর্কে আমরা মুখ্যত আলোচনা করছি তা হলো গণউৎপাদন কোড, যাকে এক দর্শন (ধনবাদী) বিকাশের হাতিয়ার করলো এবং আপন সিস্টেম অস্তিত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার কাজে লাগাল, অন্যদিকে আর এক দর্শন বিকাশের হাতিয়ার মনে করেও সেই একই সমাজে কিছু ব্যবহারিক পরিবর্তনের কথা বলল।

Society Language and Culture

উৎপাদন প্রক্রিয়া

উৎপাদনকে যে তিনটি আলংকারিক অবয়বে এখানে বিভাজন করা হয়েছে তা দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সামগ্রিক সমাজব্যবস্থায় এই তিন অবস্থানে উৎপাদন নামক একটি সাধারণ সংকেত বা সাইন'কে আমরা দেখতে পাই। উৎপাদন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ যে যে উপাদানগুলির সমন্বয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। তার মধ্যে, (১) বিনিয়োগযোগ্য 'ধন' এবং 'কারণ' যা লগ্নিপুঁজি আর 'কোড' বলে মুখ্য উৎপাদকের ভূমিকা পালন করবে; (২) 'শ্রম', যা মানবসম্পদ হিসেবে মানুষ আপন আপন ক্ষমতায়, ইচ্ছায় এবং সীমাবদ্ধতায় বিনিয়োগ করবে, আর (৩) 'জমি' বা পরিসর যা এই ধরিত্রীর অংশ হিসেবে অথবা 'মনন' হিসেবে সভ্যতার আদিকাল থেকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই তিন উপাদান এবং তাদের দ্বৈত অবস্থা স্বভাবতই শুধুমাত্র ধারণা হিসেবে থেকে যায় না বা স্বতঃসিদ্ধ কোনো কারণে বিরোধহীন সম্পর্কে থাকতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার নেপথ্যে প্রয়োজনীয় এই উপাদানগুলির নিজস্ব অস্তিত্বের শর্ত তো আছে।

যাইহোক পুঁজি আর 'কারণ' অস্তিত্বের আঁতুড়ঘর বা সিগনিফায়ার এবং এই দুই উপাদান একটি অস্ত্রের জন্ম দেয় তার নাম 'ক্ষমতা', কারণ 'ধন আর কারণ' মালিকানারই পরিভাষা। 'শ্রম'এর অস্তিত্বের শর্ত হলো 'জীবনধারণের সক্রিয়তা', কারণ জীবনপ্রক্রিয়ার মুখ্য পরিভাষাই হলো শ্রম, অর্থাৎ যে সচলতা দিয়ে আমি'র জীবনধারণকে আমরা চিনতে পারি। আর 'জমি' হলো এই ধরিত্রীকে চেনার একটি পরিভাষা, কারণ আমরা এই পৃথিবীটাকে নিজেদের মতো করে সৃষ্টি করা অবয়বের ভিত্তিতে চিনি। তাই সবচেয়ে প্রাচীন অবয়ব হলো জমি যা আজও আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যতম প্রধান পরিভাষা। অবশ্য সাম্প্রতিককালে 'জমি'র পাশাপাশি 'পরিসর'ও আর এক প্রতিবাদী পরিভাষা হিসেবে আমাদের বিকল্প ভাবনার পরিচয় দিচ্ছে। এ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার শর্ত বা উপাদান আসলে আমাদের জীবনক্রিয়া বা আরও বিশেষভাবে বললে জ্ঞাপনসক্রিয়তার উপর নির্ভর করে। তাই (১) 'কারণ বা আইডিয়া আর পুঁজি', (২) 'শ্রম এবং তারও ইচ্ছে বা অভিপ্রায়' এবং (৩) 'জমি বা পরিসর' এই তিন জোড়া পরিভাষা বা কোড'এর সৃষ্টি খুব একটা প্রাকৃতিক কারণ নিয়ে সৃষ্টি হয়নি। প্রথমে এই তিন অর্থকের পারস্পরিক সম্পর্ক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সামগ্রিকভাবে একটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম'এর পরিভাষা

Society Language and Culture

হিসেবে গড়ে তোলে। এই পরিচায়ক কোড'টিই হলো প্রতিষ্ঠান যেখানে এই তিনজোড়া পরিভাষা বা কোড এক নির্দিষ্ট মাত্রা পায়। মালিকানা বা অধিকার ব্যতীত এই সংস্থার কোনো নির্দিষ্ট বা স্থায়ী অবয়ব কিছু হয় না কারণ সংস্থা অনেকটা সাম্রাজ্যের মতো বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়ে তার অবয়ব'এর পরিবর্তন ঘটায় এমনকি এভাবে কোনো একদিন তার যাত্রাও শেষ করে। কাজেই যেটা সংস্থার জীবনচক্রের মধ্যে মুখ্যত ক্রিয়াশীল থাকে তা হলো 'অধিকার' নামক এক সামগ্রিক কোড। তাই এই কোড ঘিরেই যাবতীয় দ্বন্দ্ব আবর্তিত হয়। এখানেও রবীন্দ্রনাথ ‘রাজ্য’ বা সাম্রাজ্য নামক কোড’টির কথা অপূর্ব ভঙ্গীতে বলেছেন।

“রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি শুরু হতে থাকে” (ঋণশোধ)।

আবার অচলায়তনে বলছেন,

“আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ, এই দুটোই আমি মিলিয়ে জানতে চাই”।

অবশেষে এর সমাধানও দিলেন,

“যে রাজ্যে রাজত্বটা নেই সেই রাজ্যই সকল রাজ্যের সেরা”।

রাজত্ব ‘কোড’কে ছাড়া রাজ্যের ভাবনা অর্থাৎ আদর্শ শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথও দেখেছেন কিন্তু তার আগে ‘সাম্রাজ্য’ নামক একটি বীভৎস ‘কোড’এর আসল চেহারাটা দেখিয়েছেন। শুধু অত্যাচারের বর্ণনা নয়, সাম্রাজ্যের চেহারাটি আসলে কেমন। আর সমাধান যে আমাদের হাতে নেই সেটা বলাই বাহুল্য।

এই সাম্রাজ্য উৎপাদনের কোড'টি উৎপাদিত'র উপরে তার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এই অধিকার কোড'ই উৎপাদিত দ্রব্যের পিতৃত্বের দাবি নিয়ে সমাজে তার প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠা করে। আবার এই প্রয়োজনীয়তা পরবর্তী সময়ে হলো আর একটি কোড (সিগনিফায়ার বা অর্থক) যা এক রূপকল্প বা গল্পের মধ্যে দিয়ে সমাজে কথিত বা আলোচিত হয়। একই উৎপাদন 'দ্রব্য' আর এক উৎপাদন 'রূপকল্প' কাহিনির। এটাই তো হলো বিজ্ঞাপন। ফলে এই রূপকল্পের কাহিনি হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎপাদন যা প্রাথমিক উৎপাদিত'কে বিজ্ঞাপনে প্রতিনিধিত্ব করে আর সমাজে অসাম্য বাড়িয়ে তোলে। সংগ্রামী কার্যকলাপ আর ভোগবাদী

Society Language and Culture

কার্যকলাপ নিজ অবয়বে হিসেবে একই পরিসরে ঘটতে থাকে বিনা বাধায় এবং নেপথ্য ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে। প্রশ্ন হলো এই দুটি অবয়ব কি দ্বন্দ্বহীন ভাবে প্রকাশিত? এদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই? তাহলে কে কাকে নিরস্ত্র বা পরাজিত করবে?

আবার প্রযুক্তিভাবনার তাত্ত্বিকগণ গোটা উৎপাদন ভাবনাই প্রযুক্তি নিরিখে ভাবতে থাকেন। তাঁরা মনে করেছেন সভ্যতার আদিমতম সময় থেকেই উৎপাদন ভাবনা প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। মৌখিক প্রযুক্তি, লিখন প্রযুক্তি থেকে আজকের তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি থেকে আজকের মেশিন প্রযুক্তি, চাকা থেকে মহাকাশ প্রযুক্তি ইত্যাদি সব উপাদানই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরও আরও উন্নত এবং উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশে সহায়ক হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে পুনরুৎপাদনের বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচনা করতে হবে।

উৎপাদন ব্যবস্থাঃ কোডদর্শন

এ তো গেল কোনো এক সংস্থার সক্রিয়তার নির্দিষ্ট আবর্তনের কথা। এই ভাবে সমাজ পরিসরে আর কিছুর সামগ্রিকতা প্রতিষ্ঠা হোক বা না হোক, কোনো বিশেষ পরিসরে একটি নির্দিষ্ট শাসনতন্ত্রের অধীনে উৎপাদন সংস্থাগুলির সমষ্টি সামগ্রিকভাবে একটি ব্যবস্থা বা সিস্টেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আসলে এই ব্যবস্থাটিই হলো উৎপাদন ব্যবস্থার কোড, যা প্রতিযোগিতামূলক ধনবাদে রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর বিশ্বায়িত ধনবাদে নয়া-উদারবাদী ধনবাদে অদৃশ্য এক উৎপাদন কোড যে সারা পৃথিবীজুড়ে উৎপাদন নীতি, প্রক্রিয়াকে ঘিরে

Society Language and Culture

সামগ্রিকভাবে উৎপাদন দর্শনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই এই সামগ্রিকতা সাম্রাজ্যের চেহারা থেকে আবর্তিত হয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে আজ বিশ্বায়িত হয়েছে নয়া-উদারবাদী কোড'রূপে। দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি যে কোনো পঠনপ্রণালীতে রাষ্ট্র কোড'টিই তাই একটি গণউৎপাদনব্যবস্থা অথবা এই উৎপাদনব্যবস্থাকে ঘিরেই রাষ্ট্র কোড'টির অস্তিত্ব আবর্তিত হয়। ফলত উৎপাদনব্যবস্থা বা সিস্টেম'এ পুঁজি, শ্রম, মেশিন ও প্রযুক্তি আর জমি এই চার মুখ্য উপাদান নিয়ে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে অনেকগুলি সংস্থা তাদের সক্রিয়তা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।

এই পারস্পরিক সম্পর্কের নামে একটা গোটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করাকেই আমরা সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা বলতে পারি, যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়াই শুধু নয় উৎপাদন একটি সামগ্রিক পরিচায়ক কোড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু প্রত্যেক সংস্থার উৎপাদন প্রক্রিয়ার ধরণ, অবস্থান, নির্দিষ্টভাবেই পৃথক তাই একটি নির্দিষ্ট সামগ্রিক 'কোড'এর সৃষ্টি করা হয় সামগ্রিকতাকে চিহ্নিত করার জন্য। আবার শ্রম'এর আসল চরিত্রও যেহেতু বিপুল বৈচিত্র্যময় তাই শ্রমকোড সৃষ্টি করে তার উপরে ঘটা যাওয়া শোষণের পরিমাপ করার একটা সামগ্রিক প্রক্রিয়া বিকল্প হিসেবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিশ্বায়িত ভূসমাজে উৎপাদন কোড যত নিজেকে সংহত করেছে, শ্রমশোষণের মধ্যে দিয়ে যত নিজেকে বিস্তার করেছে, শ্রমকোড কিন্তু শ্রমের উপর ঘটা যাওয়া চরম শোষণকে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। বরং উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গ পেতে শ্রমকোড'এর বহনকারী সংগঠনগুলির উৎসাহ এবং তাকে বৈধতা দেওয়ার মাত্রা পৃথিবীজুড়েই বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাই যে কোনো নির্দিষ্ট সময় পরিসরে বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার সামগ্রিক উৎপাদন কোড সমাজ ইতিহাসকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মানবসভ্যতার ইতিহাস তাই প্রাথমিকভাবে মানুষের উৎপাদন সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতা, তারপর গণউৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকাশের পথ ধরে উৎপাদন সংস্থার জন্ম এবং সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং সবশেষে উৎপাদন কোড'কে ঘিরে পুঁজি আর শ্রমের লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে উৎপাদন সম্পর্কের সামগ্রিকতা প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে পুঁজিপক্ষ এবং শ্রমপক্ষ দুপক্ষই উৎপাদন কোডদর্শন'এর একচেটিয়া অবস্থান প্রতিষ্ঠা করেছে।

Society Language and Culture

যাইহোক এই সামগ্রিকতার কোডদর্শন সমাজ নামক প্রতিষ্ঠান বা নিয়মতন্ত্রের সামগ্রিকতারই সৃষ্টি। আর এই সামগ্রিকতার মধ্যে একদিকে ছিল উৎপাদনের বিকাশের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস আর অন্যদিকে সেই উৎপাদনের 'ভোগ' বা 'ব্যয়'এর (consumption and sumptuary value) মূল্যায়নটি অনৈতিহাসিকভাবেই সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মানুষের জ্ঞাপনসক্রিয়তা তথা ভোগ-ব্যয়ের সক্রিয়তা শুধু রাষ্ট্রের অধীন ছিল তাই নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট কোড হিসেবে সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যেই ছিল।

ফলে গণউৎপাদন প্রক্রিয়াই শুধু নয়, উৎপাদন কোড'কে কেন্দ্র করে এবং মানুষের উপর সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণকে নিশ্চিত করেই মানবসভ্যতার ইতিহাসের ধারা রচিত হয়েছে। তাহলে এই উৎপাদন কোড'এর চেহারাটি কীরকম? একদিকে ঐতিহাসিকভাবে বস্তুগত উৎপাদনের ধারা মার্কসের হাত ধরে আর অন্যদিকে মানবিক পথে ভাবনার উৎপাদনের ধারা মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড'এর হাত ধরে মানবসভ্যতার ইতিহাসের ব্যাখ্যা রচিত হয়েছিল। তবে এই পথে প্রথম ব্যাখ্যাকার হিসেবে অর্থনৈতিক ভাবনার জনক অ্যাডাম স্মিথ'এর কথা না বললেই নয়।

উৎপাদনযুদ্ধঃ দ্বন্দ্ব না প্রতিযোগিতা?

তাঁর বিখ্যাত 'দি থিওরি অফ মরাল সেন্টিমেন্টস' বই'তে অ্যাডাম স্মিথ লিখছেন,

"স্বাভাবিক স্বার্থপরতা এবং 'আরও চাই' মানসিকতাটুকু ছাড়া ধনী গরীবের থেকে খুব অল্পই ভোগ করে...জীবনের সব উন্নতিগুলো উৎপাদনের মধ্যে দিয়েই তারা গরীবের থেকে নিজেদের তফাৎ করেছে। তেমন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়াই কোনো এক অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীটাকে ভাগ করার মতো জীবনের প্রয়োজনগুলিও তারা সবার মধ্যে সমান ভাগ করে নিয়েছে। অথচ না জেনে না বুঝে সমাজের বিকাশের কথা বলেছে আর জন্ম ও বিকাশের প্রক্রিয়াগুলি করায়ত্ত করেছে"।[৪]

আবার 'দি ওয়েলথ অফ নেশনস' গ্রন্থে তিনি বলছেন,

"ভোগ বা ব্যয় হলো উৎপাদনের সমস্ত উদ্দেশ্যের একমাত্র পরিণতি বা সমাপ্তি। ফলে উৎপাদকের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ভোগী বা উপভোক্তার কাছে নিজের উৎপাদনকে প্রতিষ্ঠা করা"।[৫]

Society Language and Culture

অর্থাৎ অদৃশ্য শক্তির বিষয়টি উত্থাপিত হলো সেই সময় থেকেই, যা পরবর্তী সময়ে মার্কস হয়ে লেনিন এবং রবীন্দ্রনাথেও যার উল্লেখ পাই। উৎপাদনই যাবতীয় দ্বন্দ্বের উৎস এবং ভোগ হলো অনিবার্য কিন্তু মানুষের সামাজিকতার অন্তিম দশা। এই কী তাহলে দর্শনের সীমা? আমাদেরও ভাবনার সীমা? তাহলে সমকালীন এই বিশাল ভোগবিশ্বের ব্যাখ্যা কী করে হবে? নাকি দরকার নেই – সে এমনি এমনি যেমন চলছে চলুক। অতি বড় বিপ্লবীও পণ্যভোগের গল্পে গা ভাসাক তাতে কোনো আপত্তি নেই, শুধু সময়মতো বিপ্লবী কাজকর্ম করলেই হলো অথবা যা করছে তাকে বিপ্লবী বলে দিলেই হলো। অন্তত সেভাবেই হয়ে আসছে বেশ কিছু ক্ষেত্রে। না এভাবে হবে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বায়ন পর্যন্ত চার দশকে উৎপাদন নামক খেলা আর আস্ফালনের মেরুকরণ আমরা দেখেছি। কিন্তু তারপর যে 'ভোগ'কে উৎপাদনের অন্তিম পর্যায় বলে স্মিথ, মার্কস বর্ণনা করেছেন, সেখান থেকেই নতুন ভোগ'এর উৎপাদন যাত্রা শুরু হলো যা ছিল এককথায় অকল্পনীয়। সে কথা পরের পরিচ্ছেদেই আলোচনা করব। এখন উৎপাদনের 'আদি' পর্যায়টি শেষ করা দরকার।

উপরের বক্তব্যদুটি থেকে যে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বলা যায় তা হলো 'উৎপাদন' প্রক্রিয়াও নয় আসলে উৎপাদন নামক কোড'কে ঘিরে তাঁর ভাবনা আবর্তিত হয়েছে যেখানে তিনি উৎপাদন কোড'কে জীবনের উন্নতি বা বিকাশের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছেন। এই পর্যায়ে তিনি ধনী দরিদ্রের মধ্যেকার অসাম্য, বঞ্চনার কথা স্বীকার করেও কোনোরকম দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে আমল দেননি। আসলে তিনি সবই বলে দিয়েছেন বটে কিন্তু গরীবের সঙ্গে তফাৎ করা বা পৃথিবীটাকে আড়াআড়ি ধনী দরিদ্রের বিভাজনের বিষয়টি কেমনভাবে সম্পন্ন হবে সে বিষয়টিতে দ্বন্দ্বের অবতারণাকে তিনি আমলই দেননি বা মূল্যায়নই করেননি।

আবার ঠিক এইখানেই বস্তুবাদী দার্শনিক কার্ল মার্কস অ্যাডাম স্মিথের ধনী দরিদ্রের এই ফারাক, অসাম্যের বিশ্লেষণের পথটি অনুসরণ করেও একে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাজেই এই দ্বন্দ্ব এমন এক ভাবনার সৃজন এবং এত শক্তিশালী সৃজন যে এই দ্বন্দ্বভাবনার মূল্যায়নে জারিত হয়ে পৃথিবীতে বহু মানুষের বৈপ্লবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে গেল। সমাজ-পরিবর্তনকামী বিপ্লব সংঘটিত হলো বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে। তারপর সেখানেও ঘটল উৎপাদন কোড'এর বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তন ঘটল ধনী দরিদ্রের পার্থক্য মোছার বিকল্প আদর্শের জন্য। তবে ইতিহাসের সমকালীনতায় বিকল্পের ভাবনার উৎস সেই উৎপাদন কোড।

Society Language and Culture

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে গোটা পৃথিবীর মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠিত হলো উৎপাদন কোড'এর এক অতি উচ্চমার্গীয় অথচ অনিবার্য প্রতিযোগিতা যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব-সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের পালটা সামরিক অবস্থান মুখ্যত এক, 'জীবনযাত্রার উন্নয়ন', দুই, 'অস্ত্র উন্নয়ন' বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবনী এবং উৎপাদনী বিকাশ, আর তিন, এমনকি 'মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার উন্নয়ন'ও ঘটিয়ে ফেলল। সেই কোড এতই শক্তিশালী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে গোটা পৃথিবীটাকে একেবারে দুই আদর্শ কোড'এর মেরুতে যেন আড়াআড়ি ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। যাইহোক এই সামগ্রিক পরিবর্তনটাই উৎপাদন প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠার নিরিখেই ঘটেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই পর্যায়ে অর্থাৎ স্তালিনের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে ১৯৫০-এর দশকের শেষ থেকে পরবর্তী তিন দশক গোটা বিশ্বই দেখেছিল দুই বিপুল উৎপাদন কোড'এর আস্ফালন যে অর্থক'টি ক্রমাগত শক্তি, ক্ষমতা, দম্ভ, এবং অসাম্যই উৎপাদন করে চলছিল। যে তত্ত্ব বা সিগনিফায়েড গোটা পশ্চিমী বিশ্ব'কেই উন্নত বিশ্বের তকমা দিয়ে নয়া আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা করেছিল তার ছায়ায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যেন নতুন উপনিবেশের অধীন হয়ে দিনযাপন করেছিল। আর অধীর বিস্ময়ে দেখছিল 'আহা! উন্নয়ন কাকে বলে'। একদিকে প্রযুক্তির প্রতিযোগিতামূলক বিস্ফোরণ অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট উৎপাদিত'র ঔজ্বল্য এই দুইয়ে মিলে উৎপাদন কোড এক অভাবনীয় শক্তির জন্ম দিয়েছিল।

আবার ঠান্ডাযুদ্ধের পাশাপাশি প্রতিবাদী ভাবনা এবং উত্তর-অবয়ববাদী ভাবনা উৎপাদন'কে ঘিরে যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনার বিকাশের বিরোধিতা করল। একদিকে মার্কিনী ধনবাদী উদারবাদী-বহুত্বের নামে পৃথিবীব্যাপী নয়া শক্তিবিস্তারের পরিকল্পনা অন্যদিকে বিকল্প দ্বন্দ্বভাবনাকেও আসলে নেহাতই একটি 'কল্পক' বলে বস্তুভাবনা থেকে একে পৃথক করতে চেয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে ইতিহাসে দ্বন্দ্ব নয়, স্বাভাবিক পার্থক্য বা ভিন্নতাই পৃথক প্রাচীন কোড হিসেবে সমাজে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কায়েম হয়ে আছে। এক্ষেত্রে তাঁরা অ্যাডাম স্মিথ'এর 'ধনীর স্বার্থপরতা বা আরও চাই' মানসিকতার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর অতিরিক্ত কোনো দ্বন্দ্বভাবনাকে আমল দিতে চাননি কিন্তু তাঁদের মতে রাষ্ট্রব্যবস্থা বা উৎপাদন ব্যবস্থার 'কোড' এর মধ্যেই অসাম্যের বীজ লুকিয়ে আছে। ফলে রাষ্ট্রের মতো প্রতিষ্ঠানযন্ত্রের উপর তাঁরা ভরসা করেন নি। দুটি পরস্পর বিপরীত ভাবনার (dialectic) মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধকে তাঁরা যেমন অস্বীকার করেননি, তেমনি দ্বন্দ্ব নামক নতুন অর্থক'কে দিয়ে মানুষের সক্রিয়তার নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক পথ রচনার প্রচেষ্টাকে তাঁরা কল্পিত ও ভাববাদী আখ্যা দিয়েছেন। তাই দ্বন্দ্বের

Society Language and Culture

মতো সরলীকৃত ভাবনায় নয়, তাঁরা এই পর্যায়ে শোষণের ইতিহাস, অসাম্য, অবিচার, ক্ষমতার উৎস, ক্ষমতার আস্ফালন, ব্যক্তিসত্তার অপমৃত্যু, ভাষার আধিপত্য, একচেটিয়া কোডতন্ত্র, ইতিহাসের অন্ধকারময় পর্যায় ইত্যাদি আরও নানা বিষয়ে বিকল্প ভাবনা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে যে ঠান্ডাযুদ্ধের কথা আগে বলা হয়েছে, সেই উৎপাদন কোড'এর প্রতিযোগিতা এই সময়পর্বে বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের পরিস্থিতিকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল। এমনকি অভ্যন্তরীণ অর্থিক সংকট সত্বেও 'উৎপাদন' কোড-নির্ভর প্রভুত্ব শুধু প্রচারই করা হয়নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সেই প্রভুত্বের সামরিক রূপও দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন দেশে। তবে এই দৈত্যাকৃতি উৎপাদনব্যবস্থা নির্ভর রাষ্ট্রশক্তিগুলির সংকটও অবশ্য লুকানো গেল না। তার তখন এক নতুন সাংস্কৃতিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করলো। সে আলোচনা করার আগে সংকটটি বোঝা দরকার। কার সংকট? উৎপাদনের সংকট নাকি উৎপাদনের সামনে তাকে আড়াল করে নতুন কোনো কোড সিস্টেম'এর আত্মপ্রকাশ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তিগুলির এমন ধ্বংসের পরেও কিন্তু উন্নত দেশগুলি তাদের উৎপাদননির্ভর আধুনিকতার আস্ফালন থেকে এতটুকুও সরল না বরং রাষ্ট্রপুঞ্জ'কে সামনে আড়াল করে গোটা তৃতীয় বিশ্বেই নতুন করে আধিপত্যের কার্যধারা বজায় রাখল।

উৎপাদন কোড'এর নতুন বিষয়ানুগ পোশাকঃ ব্র্যান্ড, মল, মিডিয়া

ফলে গণউৎপাদন ব্যবস্থা বা সিস্টেমের ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনিবার্যতা এবং তার সমাপনের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মার্কস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে উৎপাদন ব্যবস্থার বিবর্তনের অনিবার্যতা এবং সংকট দুইএরই উল্লেখ করেছিলেন। উল্লেখ করে মার্কস কী বললেন? মার্কস দেখালেন, কীভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা এক দৈত্যাকৃতি আকার ধারণ করতে পারে এবং রাষ্ট্রনায়ক'দের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যায়। একথা ধনবাদের ক্ষেত্রে যেমন প্রবলতম সত্য আবার যুদ্ধপরবর্তী ও স্তালিনের মৃত্যু পরবর্তী সোভিয়েতের প্রবল উৎপাদনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সত্য। তিনি বললেন,

“দৈত্যাকৃতি উৎপাদন এবং বিনিময়ের সিস্টেম নিয়ে চলা সমাজটা যেন এক জাদুকরের মতো যে নিজেই আর ক্ষমতা'কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, অথচ যাকে এতদিন সে গড়ে তুলেছে এবং নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে”।[৬]

লেনিন ১৯২২ সালের সোভিয়েতের পার্টি কংগ্রেসে বললেন,

"মেশিন/সিস্টেম নিজেই তার নিজের নিয়ন্তাকে মানতে অস্বীকার করছে। এ যেন সেই গাড়ি যে আর চালকের নিয়ন্ত্রণে চলছে না, অন্য কারুর নিয়ন্ত্রণে চলছে, কোনো এক অদৃশ্য বেয়াড়া নির্দেশে"।[৭]

তবে রাষ্ট্রগত উৎপাদন ব্যবস্থার সংকটের যে অনিবার্যতা মার্কস, লেনিন তাঁদের সময়ে করে গিয়েছিলেন সেই সংকট এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্বে উৎপাদনকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার সময়েও ধনবাদী এবং সমাজবাদী শিবিরে আর্থিকভাবে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তাকে আড়াল করেছিল উৎপাদনের দুই 'একচেটিয়া কোড'। তৃতীয় বিশ্বের কাছে গোটা বিষয়টাই সেই দৈত্যাকৃতি অথবা আরও বৃহৎ দৈত্যাকৃতি সিস্টেম হিসেবেই পরিচিত ছিল।

উৎপাদন কোড'এর পরিবর্তে ভোগ কোড'এর উৎপাদন

কিন্তু নয়া-উদারবাদী ভাবনার নির্যাস হিসেবে মুক্ত বাণিজ্যের কোড বা তত্ত্ব'কে উৎপাদন কোড'এর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠা দিতে ১৯৭০-৮০-র দশক থেকেই প্রতিষ্ঠা করতে বেশ জোর দিয়েই নেমে পড়ে উন্নত দেশগুলি। এই অবধি সবটা পরিস্কার। কিন্তু এই লগ্নি পুঁজি আমাদের চেনা পরিসরে বিনিযুক্ত হয় নি। সৃষ্টি করা হয়েছে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির আগের পুঁজি কোড'এর থেকে ভিন্ন একটি কোড যা বিশ্বব্যাপী বিনা বাধায় বিনিযুক্ত হতে পারে। এর আশু এবং অজানা ফল হিসেবে যা ঘটতে থাকে তা হলো, এক, কর্পোরেট উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া, দুই, মুক্ত বাণিজ্যের নামে উন্নয়নশীল বাজারে যাবতীয় উৎপাদিত ব্র্যান্ডের যথেচ্ছ প্রকাশ ঘটানো এমনকি তার ধারক হিসেবে নতুন শপিং মল কোড সৃষ্টি করা, তিন, গণমাধ্যমের একচ্ছত্র বিকাশের মধ্যে দিয়ে সেই ব্র্যান্ড'এর বৈধতা দেওয়ার জন্য নতুন নতুন সাংস্কৃতিক 'কোড' উৎপাদন ঘটানো। এইভাবে একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের পরিবর্তে একচেটিয়া কোডতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। যতটা না পুঁজির জন্য কোড তার চেয়ে কোড'এর জন্য পুঁজির নিরাপদ বিনিয়োগ শুরু হলো। গণমাধ্যম সহ সমস্তরকমের মাধ্যমে নিরন্তর উৎপাদিত কোড'এর ভোগ শুরু হলো।

এর ফলে আরও যা যা ঘটল তা হলো গোটা কর্পোরেট উৎপাদনব্যবস্থা'কে একদিকে পৃথিবীব্যাপী ঘনীভূত করা হলো অর্থাৎ 'সম্মিলন এবং অধিগ্রহণ' প্রক্রিয়ায় আরও আরও বড় উৎপাদন সিস্টেম সৃষ্টি হলো আবার অন্যদিকে সে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে নিজেই নিজেকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করে নিল। ফলে এই উৎপাদন সিস্টেম আসলে একইসাথে ঘনীভূতও

Society Language and Culture

হলো এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলির আওতার বাইরে নিজেরা মূল কর্পোরেট'এর অংশ হয়ে থেকে গেল। এমনকি পরিস্থিতি এমনই হলো উৎপাদনব্যবস্থার বিকাশে প্রায় সব দেশই এখন কর্পোরেট বিনিয়োগের জন্য হাপিত্যেশ করে আছে তাদের বেকার সমস্যার সমাধান করার জন্য। মুনাফা একচেটিয়া হলো কিন্তু অবয়বটি দেশীয় হয়ে দিব্য প্রতিষ্ঠিত হলো।

সমস্যা যাই হোক না কেন এমন দ্বিমুখী বৈধতার ফলে গোটা দৈত্যাকৃতি উৎপাদন সিস্টেম'টাই নতুন নতুন কোড'এর আড়ালে চলে গেল। গণমাধ্যম তথা অন্যান্য যাবতীয় পরিসর'কে অভূতপূর্ব বিশদে ব্যবহার করা হলো এই কাজে। কে ব্যবহার করলো? যাকে মার্কস, লেনিন এবং রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছিলেন সেই অদৃশ্য হাত বা শক্তি বলে। রক্তকরবীর 'জালের আড়ালের রাজা'। ফলে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বোঝাপড়াটাই গেল বদলে।

আসলে পুনরুৎপাদনব্যবস্থা?

বহুকাল আগে ১৯৩৬ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রতিবাদী ভাবনার অন্যতম তাত্ত্বিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ The Work of Art in the age of Mechanical Reproduction-এ[৮] মুখ্যত সাংস্কৃতিক উপাদান (Cultural Material) বা শিল্পকর্মের সৃষ্টি নিয়ে একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলছেন, প্রযুক্তি এবং মেশিন আসলে সমাজের ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর মাঝখানে একটি অবকাঠামো প্রস্তুত করে। ধনবাদী সিস্টেম সেই অবকাঠামোর উন্নতি এত দ্রুত সাধন করে যে সমাজের উপরিকাঠামোর উন্নতির চেয়ে তা অনেক বেশি এবং গভীর। ১৯৩৬ সালে লেখা একথার প্রকৃত সত্য এই বিশ্বায়নযুগে বসে আমরা বিলক্ষণ টের পাচ্ছি, যখন চাহিদার নীচ দিয়ে (অপরিমাপযোগ্য) প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামো কেন্দ্রীভূত এলাকায় প্রবল বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে এবং এমন শক্তিতে পুনরুৎপাদন ঘটিয়ে চলেছে যে শুধু বার্তা বা বিষয় কোড পরিবর্তন করেই সবকিছুকে ‘নতুন’, ‘নতুন ভারশন’ বা ‘নতুন এডিশন’ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ফলে এই অবকাঠামো বা substructure-এর উন্নতির শক্তিশালী প্রকাশ ঘটে তার পুনরুৎপাদন ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে। সৃজন, শিল্পকর্ম বা মেধাজাত যে কোনো সৃষ্টিই মুখ্যত পুনরুৎপাদন বা গণউৎপাদনের জন্যই গৃহীত হয়। ফলে মেধাজাত যে কোনো সৃষ্টি প্রাথমিকভাবে তার সৃষ্টি-সৌন্দর্য হারায় এবং পুনরুৎপাদিত হতে থাকে। অর্থাৎ যখন প্রগতিশীল ভাবনা উপরিকাঠামো বা সুপারস্ট্রাকচার'এর আধিপত্য নিয়ে বেশি ভাবিত তখন

Society Language and Culture

ধনবাদী ব্যবস্থা তার অবকাঠামো বা প্রযুক্তি, মেশিন ইত্যাদির গণউৎপাদন এমন গতিতে করেছে যে কোনো শিল্পকর্ম একদিকে তার মেধাগত উৎকর্ষ এবং অন্যদিকে স্বাতন্ত্র্য হারায়। জনমানস হয়ে ওঠে নেহাৎ ব্যবহারকারী বা User বা নির্ভেজাল দর্শকসমাজ, যেখানে মানুষের পৃথক ব্যক্তিসত্তা বা 'আমি'র নান্দনিকতা বা সৌন্দর্য (aura) নেই।

আজকের বিশ্বায়নের পৃথিবীতে এই ভাবনা যে কতটা সত্য তার প্রমাণ আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে বুঝতে পারি। সৃজন, শিল্প, মেধাজাত সৃষ্টিকর্ম প্রযুক্তিগত ও যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনে এতটাই বৈধতা পেয়ে গেছে যে জনমানসের ইচ্ছে বা নিজস্ব চাহিদা এই উপাদানগুলিও এক একটি শক্তিশালী কোড'এ পরিণত হয়েছে। যার ফলে কর্পোরেট উৎপাদকমহল গণউৎপাদিতের পাশাপাশি জনমানসের ইচ্ছে'টাও গণউৎপাদন করে তুলছে। মনে রাখতে হবে প্রশ্নটা ভালো অথবা খারাপের নয়, বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুধাবন করাটাই হয়তো আজ বেশি করে প্রয়োজন।

ইচ্ছে-ক্ষমতার (অ্যাসপিরেশন) উৎপাদন

গত সত্তরের দশক থেকে উন্নয়নের সংস্কৃতির বিকাশে মার্কিনী পরিকল্পনা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যখন মুখ থুবড়ে পড়ছে অথবা তেমন কোনো উন্নয়নমুখী ফল দিতে পারছে না তখন থেকে আজ পর্যন্ত একটি বিষয় মার্কিনী গবেষকমহল থেকে বারবার বলা হচ্ছে এবং সেটা এখানকার গবেষকমহলে সত্তরের দশক থেকে প্রত্যেকটি গবেষণা প্রজন্মেই এই বক্তব্য যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। তা হলো জনগণের ইচ্ছে-ক্ষমতা বা অ্যাসপিরেশন বৃদ্ধি করা যার ফলে এক অংশের মতে উন্নয়নের সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করবে, আবার অন্য অংশের মতে প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি মার্কিনী গবেষক অর্জুন আপ্পাদুরাই'এর[৯] এক বক্তৃতায় এই ভাবনা নতুন করে সামনে এসেছে। অর্থাৎ জনগণকে সুশিক্ষিত করার যতরকমের প্রচেষ্টা স্বাধীনতার সময় থেকে মার্কিনী উদ্যোগে ঘটে চলেছে সেই পর্ব এখনো চলতেই পারে।

যে কথা এই প্রবন্ধে আমি আগে উল্লেখ করেছি যে উৎপাদন শুধু অর্থ আর বস্তু'র নয় ইচ্ছে বা কারণ অর্থাৎ সিগনিফায়ার'এরও হতে হবে বা একেও উৎপাদন বলে স্বীকার করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, ইচ্ছেক্ষমতার উৎপাদন কে বা কারা করবে? সরকার এতদিন চেষ্টা করে এসেছে, তেমন কিছু লাভ তাতে হয়নি। এ দেশে বিশ্বায়নপর্বে কর্পোরেট উদ্যোগ অশিক্ষিতকে

Society Language and Culture

শিক্ষিত করার কাজে বুনিয়াদী পর্বে শিশুশিক্ষামূলক কিছু উদ্যোগ নিতে পারে কিন্তু সার্বিকভাবে ইচ্ছেক্ষমতার উদ্যোগ যা মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারে এমন কিছু তাদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের নিরিখে তেমন কিছু আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। আর আজ করোনা আবহে লকডাউনে যখন জনগণের সামনে ভিক্ষাপাত্র সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন ইচ্ছেক্ষমতা গড়ে তোলার কাজটির পরামর্শ দেওয়া আর বাস্তবে করে তোলা কতটা কঠিন পাঠক বুঝতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর থেকে সরকারী উন্নয়ন প্রকল্প ঠিক কবে শ্রমের ইচ্ছেক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ করেছে সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই যায়। স্বনির্ভর প্রকল্পে সরকার স্বাধীন উদ্যোগের যে ক্ষমতায়ন মার্কা প্রকল্প নিয়েছে আজ পর্যন্ত, তাতে প্রকল্প বা যোজনার ঘোষণা থেকে সরকারী ঋণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক শর্ত খানিক শিথিল করলেও পুরোটাই নানারকম সামাজিক কৃতজ্ঞতাপাশের শর্তে বাঁধা, যেখানে গ্রহীতাদের স্বাধীন অগ্রগতির পথ একেবারেই সীমাবদ্ধ। অন্তত সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একথা নব্বই শতাংশ প্রযোজ্য। তবে ভোটে সদ্য মধ্যবিত্ত খানিক স্বাধীন মত প্রকাশ করে সরকার বিরুদ্ধ ভোট দিতে পারে। সেক্ষেত্রে এক অদৃশ্যশক্তির ধারাবাহিক প্রচার কর্মসূচী একদিকে সেই ইচ্ছেক্ষমতায়ও অনেকক্ষেত্রে রাশ টানতে সমর্থ হচ্ছে, আর অন্যদিকে তাকে অন্যদিকে অন্যখাতে বইয়ে দেওয়ার পর্ব চলেছে। একথাই শেষে আমরা আলোচনা করব। তাই সার্বিকভাবে গোটা দেশীয় সমাজ আজ যেন যক্ষপুরী বা ঘেটো'তে পরিণত হয়েছে যেখানে প্রলোভনটাই বেশি। রবীন্দ্রনাথ'কে এই পর্বেও টানতেই হলো, পুনর্বার মনে করার জন্য। বিশুপাগল যখন চন্দ্রা আর ফাগুলাল'কে বলছে,

"সর্দার কেবল যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি বা দেশে যাও টিঁকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে"।

নাটকের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি কথা বললেন যেখানে দু-তিনটি অমোঘ বিষয় রয়েছে।

এক, ইচ্ছেক্ষমতার উপর কারফিউ নেমে এসেছে।

Society Language and Culture

দুই, কেন? কারণ শ্রম এখানে শোষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলেও প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণ আফিমের সঙ্গে বেশি সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ শুধু অর্থনৈতিক শৃঙ্খল নয়, প্রতিষ্ঠানের নৈমিত্তিকতার সঙ্গেও শ্রম বাধ্যতামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট।

তিন, শ্রম এবং স্বর্ণ-আফিমের নতুন দ্বন্দ্ব'কে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠান নিজে অদৃশ্য হয়ে গেছে, যা মার্কস তাঁর সময়ে আন্দাজ করেছিলেন। লেনিনও ১৯২২ সালের বক্তব্যে এই সম্ভাবনার কথা বললেন। আর রবীন্দ্রনাথ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

চার, শ্রমের সঙ্গে ভোগের এই যে সম্পর্ক, যা মহাযুদ্ধের পর থেকে গোটা বিশ্বে প্রবল বেগে ছুটে এল তৃতীয় বিশ্বের দিকে, সেই নয়া শর্তের সংযোজন কোনো বিকল্প রাজনৈতিক আদর্শে সংশ্লিষ্ট হয় নি। শুধু একধরণের উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ভোগবাদ বলে চেঁচানো আর তলায় তলায় একে সার্বিকভাবে এবং অনিবার্যভাবে গ্রহণ করে নেওয়া। গণমাধ্যম থেকে শপিং মল সর্বত্র এই একই ছবি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানও স্বচ্ছন্দ্যে নিজেকে এই অতি-ভোগের আড়ালে ঢেকে নিয়েছে। ফলে শোষণ কোনোরকমে যদি বা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অতি-ভোগ আরও বেশি দেখা যাচ্ছে।

উৎপাদন কোড ও শ্রম কোড

ফরাসী তাত্ত্বিক জঁ বদ্রীলার তাঁর বিশ্লেষণে তাই সামাজিক ক্ষেত্রে উৎপাদননির্ভরতার বাস্তবতা নয়, আসলে গণউৎপাদন 'কোড' নির্ভরতার কথা বলেছেন। একচেটিয়া পুঁজিবাদী সময়ে উৎপাদনে শ্রমশক্তির শ্রমমূল্য উৎপাদিত'এর পণ্যমুল্যের সমান বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আবার প্রয়োজনীয় শ্রম এবং উদ্বৃত্ত শ্রম'কে মাপা হয়েছিল মুখ্যত পরিমাণভিত্তিক শ্রম কোড'এর ভিত্তিতে, যা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মতেও বাস্তব মানবসক্রিয়তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই আলোচনাভিত্তিক শ্রম কোড দিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রম পরিমাপ করা গেলেও আসল কায়িক শ্রম বা শ্রমসক্রিয়তার অভিপ্রায় বা শ্রমিকের আপন পরিস্থিতির বাস্তবতার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। অথচ আসলে সেই 'অপরিমিত শ্রম'কেই ব্যবহার এবং শোষণ করে দ্রব্য উৎপাদিত হলো। আর শেষপর্যায়ে বিংশশতকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পদ্ধতি অবলম্বন করল তাতে এর কোনো বাস্তবমুখী সমাধান হলো না বরং শ্রমশক্তির বেতন সবচেয়ে বেশি ধার্য করা হলো। ফলে সমাজের অন্যান্য অংশে বা নেটওয়ার্কে এমনকি প্রাদেশিক ক্ষেত্রেও এর ফলে প্রবল

Society Language and Culture

অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, আবার একে সামাল দিতে ক্ষমতার প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগও যথেষ্ট দেখা গিয়েছিল।

বর্তমান বিশ্বায়ন প্রেক্ষাপটে শোষণ'এর মাত্রা শ্রম কোড'এর চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর, গভীর এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ, যাকে পরিমাপ করাও যেমন কঠিন, তার সমাধানের পথও একমাত্রিক মনে করা যথেষ্ট সরলীকৃত। আবার একথাও পাশাপাশি সত্য যে শোষণের এমন বৈচিত্র্যময় কোড'গুলি কখনো অস্ত্র আবার কখনো আড়াল হিসেবে ব্যবহার করেই সমাজপ্রভূ থেকে রাষ্ট্রপ্রভূ সবাই তার নিজের নিজের সময়-পরিসরে জনমানসে আধিপত্য কায়েম করেছে। স্পিভাক তাঁর কালজয়ী can the subaltern speak?[১০] প্রবন্ধে আরও বলছেন,

"উৎপাদিত দ্রব্য দখল করা, সরিয়ে ফেলা, এবং শ্রমশক্তির প্রকৃত উদ্বৃত্ত মূল্য চুরি করে তা ভোগ করা এই সব উপাদানগুলি নিয়ে যেহেতু কোনো শোষণ তত্ব আজ পর্যন্ত তৈরী হয় নি, ফলে ধনবাদী শোষণকে বিভিন্ন মাত্রায়, বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন পরিসরে বিচার করতে হবে। ডিলিউজ'এর মতে মার্কসবাদের মূল বিষয়টিই হলো স্বার্থ অনুযায়ী সমস্যাকে চিহ্নিত করা। এক্ষেত্রে ক্ষমতা রাষ্ট্রগঠন এবং সংশ্লিষ্ট শোষণ অবয়ব এর চেয়ে অনেক বেশি গভীর"।

যে কথা এতক্ষণ বলা হলো, এভাবেই সামগ্রিক উৎপাদনব্যবস্থা একটা বিপুল কোড'এ পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদন কোড এবং তার মালিকানা ক্ষমতাসীন শ্রেণি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা এবং সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়ে ওঠে। আর এই উৎপাদন কোড এমনই আকর্ষণীয় যে বিকল্প প্রতিবাদী শক্তিও উৎপাদন কোড'এর সম্মোহনী ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়। আর উৎপাদিত দ্রব্য বিনা প্রশ্নে উৎপাদন কোড'এর বা অধিকারের সিগনিফায়েড হয়ে পরিচিত হয়। তাই চাষির ফসল তার নিজের হয় না কারণ সে প্রান্তিক, আর উৎপাদিত ফসল আগে রাজার হতো, পরে জমিদার, তারপরে মহাজন, মজুতদার হয়ে মধ্যভোগী দালাল এবং অবশেষে ফ্রেশ পণ্য হিসেবে শপিং মলে নব নব কোড'এ শোভা পায়। এই ফ্রেশ পণ্য তারই হয়, উৎপাদন কোড যার অধিকারে থাকে, এখন যেমন বড় বড় কর্পোরেশনগুলির হাতে। তাদের সঙ্গে চাষির সম্পর্ক মালিক-শ্রমিক'এর নয়, বরং চাষি মহাজনী সভ্যতার তুলনায় অনেকটাই স্বশাসিত, কিন্তু উৎপাদন কোড'এর অধিকার এবং সত্তাটি তার হাত থেকে চলে গেছে অদৃশ্য জাদুশক্তিতে।

তাই সেই উৎপাদিত দ্রব্য যখন পণ্য হিসেবে তার নিজের বাজারি সীমাকে গণমাধ্যম, শপিং মল এবং ভারচুয়াল পরিসরের সীমাহীনতায় পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে তখন তার

Society Language and Culture

সেই অতিরিক্ত মূল্যের সঙ্গে উৎপাদনের শ্রমমূল্যের কোনো সম্পর্ক থাকে না। সে এক সম্পূর্ণ অন্য একটি শ্রমমূল্য, যা পণ্যকে চিরায়ত বাজার থেকে নতুন বাজার, শপিং মল পরিসরে পুনপ্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব নেয়, এবং যার কোনো হদিশ সামাজিক পরিসরে নেই, তাই এর মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

এবার হয়তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে কীভাবে এবং কেন কর্পোরেট গণউৎপাদনব্যবস্থাকে গণমাধ্যম এবং ভারচুয়াল পরিসরে 'বিষয় কোড' ও 'বিজ্ঞাপন কোড'এর আড়ালে রাখা হয়েছে। কাজেই বদ্রীলারের[১১] মতে দ্বন্দ্ব বিষয়টি শুধুই আর উৎপাদনসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং ভোগ'এর সত্তায়ও সামাজিক দ্বন্দ্বটি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির নতুন সমীকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসলে এই ভোগ'এর বৈচিত্র্যময় কোড উৎপাদন বা সৃষ্টি করার নেপথ্যেও রয়েছে আর এক শ্রম। এখন প্রশ্ন হলো এই দুই উৎপাদন শ্রম একই মাত্রায় বিচার করা হবে না কেন? আসলে গণউৎপাদনব্যবস্থার উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে এলেই যে পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে তা অন্তত প্রতিযোগিতামূলক ধনবাদে বা বিশ্বায়িত নয়া-ধনবাদে স্বাভাবিক নিয়মে হয় না, এই পণ্যায়ন প্রক্রিয়ার নেপথ্যে রয়েছে সেই নতুন শ্রম, অর্থাৎ একে পণ্য বানানোর প্রক্রিয়া। বিশ্বজোড়া বিজ্ঞাপনজগত এবং বিষয়রচনা জগত (Content making) দিয়ে এর খানিক স্বরূপ আমরা টের পাই, যদিও এই পণ্য উৎপাদন (দ্রব্য উৎপাদন নয়) কোড প্রক্রিয়ার বিষয়গত ব্যাপ্তি অনেক বেশি।

ফলে আজকের পণ্যমূল্য আর দ্রব্যের উৎপাদনমূল্যের তথা শ্রমমূল্যের সমানুপাতিক নয়। উৎপাদনের শ্রমমূল্য অন্য মাধ্যম পরিসরে পণ্যমূল্য (price of commodity) থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বভাবতই বিপন্ন। একদিন প্রযুক্তির আধুনিকতা যেমন শ্রম'কে বিপন্ন করে তুলেছিল, উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল অনেকাংশে, অন্যদিকে গণমাধ্যমে ও অন্যান্য মাধ্যমে পণ্যের অভাবনীয় বিস্তার শ্রম'কে দ্রব্য (Product) উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন না করলেও পণ্যমূল্য থেকে তো বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ফলে উৎপাদন 'শ্রম' আজ এই একবিংশ শতকে চরম শোষিত এবং তার বিকাশের পথ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে, কারণ সে পণ্যের মূল্য থেকে বিচ্ছিন্ন। আবার পণ্যের বিস্তারের নেপথ্যে যে নতুন শ্রম এবং সৃজনী শক্তি কাজ করছে সেও কিন্তু একইভাবে বিপন্ন। তথ্য প্রযুক্তি'র উপর নির্ভরশীল কল-সেন্টার, বিজ্ঞাপনের সৃজন এবং বিপণন জগত, দ্রব্যের কন্টেন্ট সৃজন, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার, সামাজিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের জন্য পরিসর দখল ইত্যাদি কাজে যে বিপুল শ্রম নিয়োজিত রয়েছে তার 'কোড' এখনো সৃষ্টিই হয় নি, বা

Society Language and Culture

তার পরিচয়টাই এখনো পুরো পাওয়া যায় নি। ফলে সংগঠিত বা অসংগঠিত দুই ক্ষেত্রেই এই বিপুল শ্রম আজ অগোছালো এবং চরম শোষিত। এই দুই শ্রম'কে এক করে দেখলে আসল সংকট'কে বোঝা যাবে না, আবার পৃথক করে দেখলে সংকট টের পাওয়া যাবে বটে, কিন্তু সামগ্রিক 'শ্রমশক্তি' কোড'টি সংকটে পড়বে, কারণ দ্বিতীয় অর্থাৎ পণ্য-উৎপাদন শ্রম প্রথম দ্রব্য উৎপাদন শ্রম'এর সংকটের জন্য দায়ি, কারণ এর কোনো আর্থিক সুফল প্রথম অর্থাৎ দ্রব্য উৎপাদনকারী শ্রম পাচ্ছে না, আর দ্বিতীয় শ্রম'কে সাম্প্রতিককালে বিকাশের অন্যতম হাতিয়ার মনে করছে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রশক্তিগুলি। যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্পক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক শ্রম ব্যবহার করে আসলে শ্রম'এর উপর থেকেই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চাইছে কর্পোরেট এবং রাষ্ট্রশক্তিগুলি।

এটাই আজকের সংকট। গণউৎপাদনব্যবস্থায় শ্রমশোষণ'কে 'ভোগ'এর (consumption) বিপুল সিগনিফায়ার'এর আড়ালে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভোগ'এর কোড'এর আড়ালে শ্রমশোষণ বিষয়টিকে এতটাই দুর্বল ও বিপন্ন করে রাখা হয়েছে যে শ্রমসত্তা নিজেই বিনোদন ভোগ'এর (দ্বন্দ্বহীন সাংস্কৃতিক) গণউৎপাদনের স্রোতে ভেসে নিজের বিপন্নতাকে আড়াল করার প্রয়াস নিয়ে চলছে। একদিকে গণউৎপাদনব্যবস্থায় বাস্তবিক শ্রমের ব্যাপক শোষণ অন্যদিকে ভোগ কোড'এর উৎপাদনে অন্যান্য বৈচিত্রপূর্ণ শ্রমের শোষণ - এই দুই মাত্রার শোষণের চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। প্রত্যেকটি পর্যায়ে শোষণের মাত্রা ভোগ'এর ঝলমলে কোড'এর আড়ালে তার কার্যসিদ্ধি করে চলেছে। ফলে উৎপাদন কোড'এর চরিত্র যেমন বদলেছে শ্রমের প্রশ্নে উৎপাদনব্যবস্থা কিন্তু ততটাই আমানবিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিনোদন, শপিং মল, গণমাধ্যম এই তিন পরিসরে ভোগ'এর কোড এতটাই শক্তিশালী যে তাকে ডিঙ্গিয়ে শোষণ বোঝার জন্য যে বিকল্প মৌলিকতা প্রয়োজন এবং ক্ষমতার বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানের প্রয়োজন সেই বিকল্প মৌলিক রাজনৈতিক পরিসর সত্যিই বিরল।

সূত্রউৎসঃ

১। শঙ্খ ঘোষঃ কবির অভিপ্রায়; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ১৯৯৬।

২। তদেব;

৩। তদেব;

৪। অ্যাডাম স্মিথঃ দি থিয়োরি অফ মরাল সেন্টিমেন্টস; ব্রিটানিকা।

Society Language and Culture

৫। অ্যাডাম স্মিথঃ দি ওয়েলথ অফ নেশনস; অফ সিস্টেমস অফ পলিটিকাল ইকোনমি; আ উইলকো বুক।

৬। শঙ্খ ঘোষঃ কবির অভিপ্রায়; রবীন্দ্রভারতী প্রকাশন।

৭। তদেব;

৮। ওয়াল্টার বেঞ্জামিনঃ দি ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দি এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন, ১৯৩৬।

৯। অর্জুন আপ্পাদুরাইঃ দি কালচার অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ কালচার; প্রফেসর জেকব জন কাট্টাকায়ম মেমোরিয়াল লেকচার, ২০২১; ইন্সটিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন (আইএস আর এ)।

১০। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকঃ ক্যান দি সাবঅল্টার্ন স্পিক; কলাম্বিয়া ইউনিভারসিটি প্রেস।

১১। জঁ বদ্রীলারঃ দি মিরর অফ প্রোডাকশন; টেলোস প্রেস।

এই প্রবন্ধের মূল বিষয়টি লেখকের 'মানবসত্ত্বার অভিপ্রায়ঃ দ্বন্দ্বের নানামুখ'; (একুশ শতক) গ্রন্থে আলোচিত।

Society Language and Culture